বাঙালি মুসলমানের
রামমোহন চর্চা

সংকলন ও সম্পাদনা
নিখিলেশ গুহ
শংকরকুমার বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

কাজী আবদুল ওদুদ

রামমোহন রায় ২৫

বাংলার জাগরণে প্রভাত-নক্ষত্র ৪৬

নেতা রামমোহন ৫১

তুহফাতুল মুওহ্হিদীন ৫৬

রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য ৬২

সৈয়দ মুজতবা আলী

রামমোহন রায় ও ইলম-উল-কালাম ৬৭

রামমোহন রায় ৭২

সালাহউদ্দীন আহমেদ

রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ ঃ একজন অব্রাহ্মের চোখে ৭৫

পরাধীন ও স্বাধীন ভারতবর্ষের রামমোহন রায় ৮৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
রামমোহন ও ইসলাম ৯৫

বিবিধ

মৌলভী আবদুল করিম ঃ রাজা রামমোহন রায় ১০৯

শামস্-উন-নাহার মাহমুদ ঃ মুসলিম নারীর অর্ঘ্য ১১১

আবুল হাসনাত ঃ বাংলা কাব্যে আরবি-ফার্সি
সাহিত্যের প্রভাব ঃ রামমোহন থেকে নজরুল ১১৩

পরিশিষ্ট

i. Maulavi Wahed Hussain : Monotheism and Universalism in Rammohun and in Islam ১৫১

ii. Maulavi Abdul Karim ১৫৩
a) Rammohun as a Religious Reformer
b) Rammohun, The Type and Pioneer of Modern India.

iii. Humayun Kabir, Rammohun and the Fundamental Unity of all Faiths. ১৬০

iv. Salahuddin Ahmed, Rammohun Roy and His Contemporaries. ১৬৫

ভূমিকা

রামমোহন প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান লেখকরা যথেষ্ট সংখ্যায় সামিল হননি। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে তাঁদের যে আলোচনা প্রকাশ পেয়েছে তার মূল্যও কম নয়।

এ-গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ইসলাম সংস্কৃতির পটভূমিকায় তাঁর মহত্বের মূল কারণানুসন্ধান। রামমোহন প্রতিভার এই দিকটি অন্যত্র সর্বদা যথাযথভাবে পরিস্ফুট হয়নি বললে সত্যের অপলাপ হবে না। অথচ রামমোহন প্রতিভায় ইসলামি উপাদান ছিল বহু। তাঁর জন্মকালে বাংলায় নবাবী শাসনের অন্তরাগ ক্রমবিলীয়মান হলেও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। প্রথানুগতভাবে বঙালি হিন্দুর ঘরে তখনও আরবি ফার্সি ভাষার চল ছিল। রামমোহন অল্প বয়সেই ঐ দুটি ভাষা শিক্ষা করেন, কাশীতে সংস্কৃত ভাষাও তিনি উত্তম-রূপে অধ্যায়ন করেছিলেন। পরিণামে তাঁর প্রথম যে রচনাটি আমাদের কছে পৌছেছে সেই 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওয়াহহিদ্দীন' অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদীদের প্রতি নিবেদন' নামক সন্দর্ভটি তিনি রচনা করেন। একটি আরবি ভূমিকা সম্বলিত এই বইটিতে রামমোহনের প্রখর যুক্তিশীলতা এবং একেশ্বরবাদে গভীর বিশ্বাস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বহু পূর্বে রামমোহনের মানসিক গঠনে মুসলমান একেশ্বরবাদী মুওয়াহহিদ্দীন এবং অষ্টম শতকে মুসলিম যুক্তিবাদী 'মুতাজিলা'দের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ফার্সি গজলের পাশাপাশি অনুবাদের মাধ্যমে প্লেটো, অ্যারিস্টোটল এবং নব্য-প্লেটোনিক (neo-platonic) ধারণার সঙ্গে পাটনায় ছাত্রাবস্থায় পরিচয়ের মাধ্যমেই রামমোহনের প্রথম মানসিক উন্মেষ ঘটে। 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওয়াহহিদ্দীন' পুস্তিকায় সমগ্র মনুষ্যজাতিকে তিনি চারভাগে ভাগ করেছেন—

'প্রথমত একজাতীয় প্রতারক যারা অন্যলোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করতে নিজের ইচ্ছামত ধর্মীয় তত্ব ও ধর্মমত উদ্ভাবন করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে উত্তেজনা ও বিবাদ-বিরোধের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, প্রতারিত এক জাতীয় লোক যারা কোনো রকম বিচার-বিবেচনা না করেই অন্যের আনুগত্য স্বীকার করে। তৃতীয়ত, প্রতারক ও প্রতারিত এক জাতীয় লোক যারা আর কারও কথায় বিশ্বাস করে অন্য লোকদেরও সেই বিশ্বাসে প্ররোচিত করে। চতুর্থত, মহামহিম ঈশ্বরের করুণায় যারা প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়।'

'তুহফাৎ' এর সূচনায় রামমোহন বলেছিলেন—

'পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে সমতল দেশ বা পার্বত্য অঞ্চল যেখানেই সফর করেছি সেখানকার অধিবাসী সবাই দেখেছি সাধারণত একটি পরমসত্তায় বিশ্বাসী যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। যদিও সেই পরমসত্তায় আরোপিত বিশেষ বিশেষ গুণাগুণ, বিভিন্ন ধর্মনীতি এবং শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নিয়ে তাদের মধ্যে মতবৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়।'

'তুহ্ফাৎ' কোনো ধর্মকে সম্পূর্ণ সত্য হিসাবে স্বীকার করেনি। প্রতি ধর্মের প্রবক্তাই রামমোহন বলেন, তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অলৌকিক কোন ঘটনা (miracle) বা প্রত্যাদেশের উল্লেখ করেন যা যুক্তি বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না। ধর্মীয় নেতারা শিষ্যদের ভয় দেখিয়ে বা দমন করে আনুগত্য দাবি করে। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় নিজেকে অভ্রান্ত মনে করায় পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হয়। অপরদিকে একেশ্বরে বিশ্বাস সব মানুষের মধ্যে সহজাত; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে তবে সে সত্য-মিথ্যা, সদ-অসতে ভেদ করতে পারে। ধর্মাচরণে তাই মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হাফিজের ফার্সি কবিতা স্মরণ করেছেন রামমোহন যেখানে বলা হয়েছে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্ষমার চোখে দেখা উচিত, কারণ সত্যানুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে তারা কল্পকাহিনীর পথ আশ্রয় নিয়েছে। হাফিজ উপদেশ দেন, -কারো অনিষ্ট সাধন করো না, কারণ আমাদের সাধন পন্থায় তা ছাড়া আর কোন পাপ নেই। আমরা ঈশ্বরের প্রেরণায় সামাজিক কর্তব্য করি এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হই। ঈশ্বর-আরাধনায় এটিই প্রকৃত পথ, একমাত্র এই পথ ঈশ্বরের অনুমোদিত।

'তুহ্ফাৎ'-এর পাঁচ জায়গায় রামমোহন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোরানের বাণী উদ্ধার করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি এই গ্রন্থের সঙ্গে কতখানি একাত্মবোধ করতেন।[১] 'তুহ্ফাৎ'-এর ধর্মীয় আলোচনা দীর্ঘকাল মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করেছে। ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুর অনুরোধে পুস্তকটি ১৮৮৩ সালে ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন মৌলানা ওবেদুল্লাহ্ আল-ওবেদী। তিনি ছিলেন সেকালের প্রগতিশীল মুসলমানদের অন্যতম। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে ঢাকা শহরে মাদ্রাসা স্থাপিত হবার পর তিনি তার প্রথম সুপারিন্টেডেন্ট নিযুক্ত হন। স্যার সৈয়দ আহমদের আমন্ত্রণে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্-এর সদস্য হন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে মৌলানা ওবেদুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সমাজ সম্মিলনী'। দীর্ঘস্থায়ী না হলেও সমাজসেবার ক্ষেত্রে সম্মিলনী উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ওবেদুল্লাহ্ এই সংগঠনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের শেষদিকে 'তুহফাৎ'

অনুবাদের পাশাপাশি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তাঁর উদ্যোগে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' বা 'Dacca Mohammedan Friends Association' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ সালে মৌলানা ওবেদুল্লাহ প্রয়াত হন। বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে সম্মিলনী কাজে নামলেও মুসলিম সমাজের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কাজ শেষ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মুসলিম মেয়েদের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং সেই অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'সম্মিলনী' শেষ করে। নিয়মিত পরীক্ষা এবং সফল ছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লর্ড কার্জনের শাসনকালে সরকার বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে যে অল্প সংখ্যক মুসলমান বিরোধিতা করেছিল 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' ঢাকায় এক জনসভা ডেকে তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলান। সম্মিলনীর আশঙ্কা ছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম পৃথক রাজ্য হিসাবে গঠিত হলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা মহসিন ফান্ডের টাকা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তবে ঢাকা মুসলমান সম্মিলনী পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ দাগ কাটতে পারেনি। ১৯০৫ সালে তার বিলুপ্তি ঘটে।[২]

তখনকার মুসলমান সমাজে মৌলানা ওবেদুল্লাহ্ ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী, যেমন ছিলেন কবি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), যিনি সমাজ সংস্কারক হিসাবে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।[৩] সাধারণভাবে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রামমোহনের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হতে আরও বহু বছর লাগে। ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা এবং তাকে কেন্দ্র করে বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলন থেকে এর সূচনা বললে ভুল হবে না। এই আন্দোলনের দুই প্রধান পুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল ফজলের লেখা থেকে একথা স্পষ্ট। ওদুদ তাঁর 'বাংলার জাগরণ' গ্রন্থে বলেছেন বুদ্ধি মুক্তির মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে, কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তফের লেখক রোমা রোলারঁ কাছ থেকে, আর মহম্মদের কাছ থেকে। আবার মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক আবুল হোসেন ১৩৩৬ সালে লেখেন—

> আমি মনে করি, ভারতের সৌভাগ্য যে, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান- দীপ্ত, অতীতের মোহ সংস্কার মুক্ত ইংরাজ এদেশে প্রভুত্ব করতে এসেছে।...আধুনিক ভারতের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিই সর্বপ্রথম একথা বলে গেছেন—আমরা তা ভুলে গেছি। তিনি হচ্ছেন এই বাংলার যুগ-মানব রাজা রামমোহন। তিনি জ্ঞানকে মুক্তির উপর স্থান দিয়ে দেশবাসীকে বলেছিলেন, ব্রিটিশের আমলে তোমরা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনকে আয়ত্ত কর—অতীতের শাস্ত্র-কঙ্কালের পূজা ছেড়ে দাও।

'তরুণের সাধনা', যে প্রবন্ধ থেকে ওপরের উদ্ধৃতিটি নেওয়া, সেখানে রামমোহনের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যার হাত থেকে মুক্তি খোঁজেন এই বলে ঃ

> রাজা রামমোহনের হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় সাধনে এক জাতি গঠনের স্বপ্ন ছিল। দুঃখের বিষয়, আধুনিক হিন্দুর নিকট রামমোহন মাত্র একটি নাম—তাঁর সাধনার ধারা ও রূপ সম্বন্ধে তার যেন কোন সজ্ঞান পরিচয়ই নাই। মুসলমানও তাঁর পানে দৃষ্টি দেয় নাই। আজ তাঁর জীবনে আমাদের বর্তমানের এই অভিশাপ হতে মুক্তির উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।[৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একদিকে কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের আধুনিকীকরণ এবং অন্যদিকে সাহিত্যের আকাশে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মপ্রকাশ বাঙালি মুসলমানকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ তো ছিলই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক বুদ্ধি মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে কেউই কাজী আবদুল ওদুদের মতো রামমোহন প্রসঙ্গে এত বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। ওদুদ প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। জীবনের একটি পর্যায়ে (১৯২০-৪০) ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করলেও দেশভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান এবং এখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে (১৯৭০)। ওদুদের বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থে রামমোহনের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে তার থেকে বোঝা যায় তাঁর জীবনে রামমোহনের প্রভাব কতখানি গভীর ছিল। আবুল হুসেনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের সম্পূর্ণ মিল প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর 'নবপর্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড)' গ্রন্থের 'নেতা রামমোহন' শীর্ষক আলোচনায়। সেখানে তিনি বলেছেন—

> রামমোহনের বিরাট চিত্ত হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রবল ভাবধারায় সঙ্গমস্থল ছিল। হিন্দু সেই মহাতীর্থে স্নান করে কিছু শক্তি ও শ্রী অর্জন করেছে। এ তীর্থ যে মুসলমানেরও শক্তি ও শ্রীলাভের জন্য অমোঘ শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক, মুসলমানকেও একথা স্বীকার করতে হবে।

ঐ গ্রন্থেই 'বাংলার জাগরণ' শীর্ষক এক রচনায় ওদুদ বাঙালির রামমোহনকে গ্রহণ করার অক্ষমতার কারণ সন্ধান করেছেন এইভাবে—

> মনে হয়, বাঙালীর রামমোহনকে গ্রহণ করার সবচাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে সে সাধারণত ঘর-মুখো আর রামোহন ঘর-মুখো ছিলেন না। এই বাহির-মুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্তমান বাঙালী জীবনে বড় সাধনা-হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান, শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ-পথের সমূল আহরণ তার পক্ষে সহজ হবে।

এইখানে 'বাহির-মুখো' বলতে ওদুদ বুঝিয়েছেন চিত্তের সেই প্রসার, যা অনাত্মীয়কে আত্মীয় করতে পারে।

রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে ওদুদ তাঁর কর্ম ও জীবন পর্যালোচনা করেন এক প্রবন্ধে যা তাঁর 'সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (১৩৪১)। জীবিতকালে রামমোহন 'জবরদস্ত মৌলবী' আখ্যা লাভ করেছিলেন, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। 'মিরাট-উল-আখবর' নামে ফার্সি ভাষায় একটি পত্রিকা তিনি কিছুকাল প্রকাশ করেন। পার্লামেন্টে সাক্ষ্য দেবার সময় রামমোহন উচ্চপদস্থ মুসলিম রাজকর্মচারীদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন। বস্তুত হিন্দুদের তুলনায় তিনি বেশভূষা, বিদ্যা-বুদ্ধি, চরিত্র এবং শারীরিক বীর্যে মুসলমানদের এগিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ওদুদ মনে করেন—'এই যে সম্প্রীতি সম-মতের সম্প্রীতি এ নয়, সম-বৈদগ্ধ্যের এ সম্প্রীতি।' মুসলিম সাধনা ও মুসলিম-প্রকর্ষ তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু এসবের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। তাই পার্শীর পরিবর্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করবার পরামর্শ তিনি দেন। ওদুদ বলেন—

> কোরআন থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্প কয়েকটিতে ঈশ্বরের মহিমা অতি সুন্দর রূপ লাভ করেছে....।

বিষয়টি বোঝাবার জন্য কোরানের কতকগুলি বচনের পাশাপাশি ওদুদ রামমোহনের কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতের পংক্তি উদ্ধার করে দেখিয়েছেন।

'সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধটি এ বিষয়ে ওদুদের দীর্ঘতম রচনা। ঐ বছরই 'রামমোহনের বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য' নামে অপর একটি আলোচনায় তিনি সমালোচকদের বক্তব্য খণ্ডন করে দাবি করেন আধুনিককালে ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুদর্শনের সবচেয়ে সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রামমোহনের রচনায়। তাঁর মতে—

> ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধী হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন মানুষের জন্য তা কম মূল্যবান নয়; কিন্তু জীবনের বহুভঙ্গিমতা ও ক্রমোৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে এঁদের কথার মর্যাদা নিরূপণ করতে গেলে মনে হয়, হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে রামমোহনের পথ নির্দেশই বেশি মূল্যবান, কেননা এঁদের চাইতে রামমোহনের মনীষা শ্রেষ্ঠতর, আর শুধু হিন্দুর নয় অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতির মানুষেরও তিনি বেশি আত্মীয়।

এই মন্তব্যে রামমোহনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলেও অন্যান্য মনীষীদের সঙ্গে তাঁর তুলনায় সামঞ্জস্য রক্ষা পেয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন অনিবার্য। বিতর্কে প্রবেশ না করে আমরা বরং 'রামমোহন রায়' শীর্ষক ওদুদেরই আর একটি প্রবন্ধের দিকে তাকাতে পারি যেখানে তিনি বলেন—

> রামমোহন যে তাঁর দেশবাসীকে অতীত বা বর্তমান বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করেছিলেন, সে মন্ত্রের যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই। সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কোন ত্রুটির জন্য নয়—তার দেশবাসীর সত্যপ্রীতির ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণ-কামনায় অভাবের জন্যই।

অন্য একটি কারণও ওদুদ এই লেখায় উল্লেখ করেছেন। সেটি হল—

> রামমোহনের হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদেরও তেমন শ্রদ্ধার বস্তু হয় নাই হিন্দু সাধনা সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের ফলে। তাঁর সুবিখ্যাত বাণী, ''যত মত তত পথ'' দেশের লোকেদের অনেক বেশি স্বস্তি দিয়েছে রামমোহনের 'লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র'এই মন্ত্র থেকে।

কোরানের দুটি উপদেশ রামমোহনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধে ওদুদ উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, স্ত্রী জাতির প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন। কোরানের একটি বাণী (৪ঃ১৯) এই প্রসঙ্গে ওদুদ উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে—'যদি তোমরা তাদের (স্ত্রী-জাতিকে) ঘৃণা কর তা হ'লে হতে পারে তোমরা এমন একটা জিনিস অবজ্ঞা করলে যার ভিতরে আল্লাহ্-এর পর্যাপ্ত কল্যাণ নিহিত করেছেন।'

দ্বিতীয়ত, পরধর্মসহিষ্ণুতা কোরান বলে (৬:১.৯) 'আল্লাহ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের' উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানবশতঃ সীমা অতিক্রম করে আল্লাহকে গালি দেয়।' অন্যত্র (২৫:৬৩) তারাই পরম কারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে ''সালাম'' (শান্তি)।

হাফিজ, সাদী, রুমি-র মতো সুফী দার্শনিক ও কবিদের প্রতি রামমোহন কত অনুরক্ত ছিলেন ওদুদ তা উল্লেখ করেছেন। পার্লামেন্টের কাছে প্রেরিত তাঁর এক প্রতিবেদনে (Communications to the Board of Control) সাদির একটি উপদেশ তিনি শাসকদের মনে করিয়ে দেন। ওদুদের অনুবাদে তো এইরকম:

> প্রজাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ হও ও (এইভাবে) তোমার
> শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হও।
> কেন না ন্যায়পরায়ণ নরপতির সৈন্য হচ্ছে তার প্রজা।

সুফী ধর্মের বিশ্বজনীন মানবতাবাদ এবং সংকীর্ণ মোল্লাতন্ত্রের বিরোধিতা রামমোহনকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। 'তুহ্ফাত' প্রসঙ্গে আলোচনাকালে আমরা দেখেছি রামমোহনকে হাফিজের বাণী উদ্ধার করতে। রুমির রচনার প্রতি রামমোহনের আকর্ষণের কোন প্রমাণ তিনি পাননি বলে ওদুদ জানালেও কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখায় পড়ি রামমোহন একবার বার্ধক্যে রুমির লেখা 'মসনবী' ও বেদান্ত গ্রন্থ হাতে নির্জনে গুহাবাসী হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।[৫] সুফীদের মিষ্টিক (mystic) প্রকৃতি ও বিশ্বজনীন মানবপ্রেম রামমোহনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। সুফীদের ওয়াদাত-উল-ওজদ তত্ত্ব বলে ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সৃষ্টি তা এক পরম ঐক্যে মিলে যায়। রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে এই একই চিন্তাপ্রকাশ পায়।

কাজী আবদুল ওদুদ
রামমোহন রায়
বাল্যজীবন

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম। মিস্ কলেটের এই মত নেবার যোগ্য।

তাঁর বালক-কালের দুইটি ব্যাপার বেশ চোখে পড়বার মতো; একটি, তাঁর মেধাশক্তি, অপরটি, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে ভক্তি। প্রথমটির বাঞ্ছিততম পরিণতি তাঁর পরিবর্তী জীবনে ঘটেছিল একথা সবাই জানেন; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। কোনো কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া গেছে, যেমন, বাল্যের চঞ্চল ও তার্কিক নিমাই হয়েছিলেন ভক্তিরসাপ্লুত শ্রীচৈতন্য। কিন্তু অনেকের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় না। বালক-বুদ্ধদেবকে আমরা দেখতে পাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও পর্যবেক্ষণশীল; বালক-মোহম্মদ সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমসাময়িক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য; আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরোহিতের সন্তান হয়েও দেবতার সম্মুখে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না। —তবে রামমোহনের বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে একটি সুন্দর পরিণতিও লাভ করেছিল। রামমোহনের যোদ্ধবেশ বন্ধুর চোখে এত মহিমময় ও শত্রুর চোখে এত নিষ্করুণ যে তাঁর অন্তরের পরমাশ্চর্য কোমলতা তাঁদের চোখে পড়বার অবকাশ পায় না। একটি অন্তঃপ্রবাহী ভক্তিধারা তাঁর ভিতরে ছিল, শুষ্ক জ্ঞানমার্গী তিনি ছিলেন না, একথা আজ সুবিদিত; তার সঙ্গে একথাও আমরা জানি যে এই পুরুষসিংহ অভিনয়ের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি, বিগত জীবন বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অশ্রু-তর্পন তাঁর জন্য ছিল অতি স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ডের লোকদের তার সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল— The oriental gentleman, versatile, emotional yet dignified.[১] এটি যথার্থ ধারণা।

এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সে-কামনা ছিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হন নয় বৎসর বয়সে।

---

১. (তিনি) একজন প্রাচ্যদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, ভাবপ্রবণ, কিন্তু প্রভাববান। কথাটি মিস্ কলেটের লিখিত জীবনীতে আছে।